BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03110045

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 11| November 2025| e-ISSN: 2584-1890

জীবন সরকারের ছোটগল্প : গঠনপর্ব ও বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা

Mitali Singha

Email : mitalisingha27@gmail.com

Abstract: *গবেষণাধর্মী নিবন্ধটিতে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক জীবন সরকারের ছোটগল্পের বহুমুখী সামাজিক প্রেক্ষাপট, জীবন-অভিজ্ঞতা এবং তাঁর অনন্য শৈলীগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মাত্র ছয় বছর বয়সে দেশভাগের কারণে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে উত্তরবঙ্গে এবং পরবর্তীতে কলকাতায় চলে আসার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রবন্ধটিতে লেখকের গল্পসমূহকে বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে প্রধানত পাঁচটি ভাগে- দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন, নাগরিক ও গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি, শিশু-কিশোর এবং বিবিধ শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গল্পকারের রচনায় একদিকে যেমন দেশভাগের যন্ত্রণা, ছিন্নমূল ও উদ্বাস্তু মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার তীব্র সংগ্রাম এবং ভূমিপুত্রদের অবহেলা ও নির্মম অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে তেমনই কলকাতার ফুটপাতবাসী ও প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন যন্ত্রণাক্লিষ্ট বাস্তব জীবন নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে। এর পাশাপাশি গ্রামীণ ও নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, দাম্পত্যের টানাপোড়েন, শৈশবের রূপকথার জগত ভেঙে যাওয়ার বিষাদ এবং মানবজীবনের শাশ্বত প্রেমের অনুষঙ্গও তাঁর গল্পে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। ভাষাগত দিক থেকে পূর্ববঙ্গের উপভাষা, উত্তরবঙ্গের কামরূপী উপভাষা এবং কলকাতার নাগরিক কথ্য ভাষার দক্ষ প্রয়োগ তাঁর সাহিত্যকে এক অনন্য উচ্চতা দান করেছে। সামগ্রিকভাবে, জীবন সরকারের গল্প যে বহুমাত্রিক জীবনবোধ ও সমাজ-মনস্তত্ত্বের এক উজ্জ্বল দলিল, তা-ই এই নিবন্ধে সার্থকরূপে প্রতিপাদিত হয়েছে।*

Keywords: *জীবন সরকার, ছোটগল্প, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সংগ্রাম, নাগরিক ও গ্রামজীবন, প্রান্তিক মানুষ ও ফুটপাতবাসী, প্রকৃতি ও সমাজ-মনস্তত্ত্ব।*

Introduction: মানুষ ছাড়া সমাজ সৃষ্টি হয় না, সমাজ ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। তাই সমাজ ও সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক। লেখক জীবন সরকারের লেখা পড়লে তার সমসাময়িক সমাজ ও সমাজের বিচিত্র মানুষ সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পাই। সমাজে কিছু মানুষ যেমন ধূর্ত, অসাধু, কুট প্রকৃতির তেমনি আবার কিছু মানুষ সৎ, সরল, আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। স্বাধীনতার পরবর্তী উদ্বাস্তু মানুষগুলির জীবন, জীবিকা, অবক্ষয়, গ্লানি, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবল সংগ্রাম সেটা পশ্চিমবঙ্গের ভেতর হোক বা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আসাম, ত্রিপুরা, আন্দামান সকল উপেক্ষিত মানুষদের অসহায়তার কান্না তার ছোট গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। তার গল্পগুলি পড়লে বোঝা যাবে দেশভাগের পর কত লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জন্মভিটে ত্যাগ করে ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছিল। কোথাও এদের মাথা গোজার ঠাই মেলেনি। মিললেও তা স্থায়ী হয়নি। তার ওপর ছিল ভুমিপুত্রদের নৃশংস অত্যাচার, ঈর্ষা, চোখ রাঙানি। তারা এদেশে এসে যেন ভূমিপুত্র দের চোখ রাঙানির দয়ায় বেঁচে ছিল। এটাই ছিল তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

Discussion: জীবন সরকার জীবনকে দেখেছেন একেবারে ভিতর থেকে। ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে সাহিত্যচর্চা তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর জীবনের ক্ষেত্রটাও বেশ বড়, নানা অভিজ্ঞতায় ভরা। মাত্র ছয় বছর বয়সে দেশভাগ জনিত কারণে পূর্ববাংলার জল, মাটি, বাতাস ছেড়ে উত্তরবঙ্গে চলে আসেন। তারপর কলকাতা। জীবন সরকারের এই সুদীর্ঘ পদচারণার অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তাঁর লেখায় বারবার উকি দিয়ে যায় ছেড়ে আসা মাতৃভূমি বাংলাদেশে নিজের গ্রামে কলকল করে বয়ে

যাওয়া ধলেশ্বরী নদীর কথা, নদীর উদাসী হাওয়ায় জীবন জুড়ানোর কথা, ছিন্নমূল মানুষগুলির বোবাকান্নার কথা। বাংলাদেশের প্রকৃতি আর মানুষের স্মৃতি তাঁকে আলোড়িত করে, তাঁকে বিহ্বল করে। তাঁর গল্পে যেখানেই বাংলাদেশের কথা আসে, সেখানেই যেন মনে হয় এক স্নিগ্ধ অতীত তাঁকে ঘিরে ধরেছে। যেন তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে সেই ভূমিতে, তাঁকে ভরিয়ে তুলেছে চেনা-জানা এক জগতকে পুনরাবিষ্কারের আনন্দে।

বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে জীবন সরকারের ছোটোগল্পগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

১. দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত

২. নাগরিক জীবন ও গ্রামজীবন সংক্রান্ত

৩. প্রকৃতি বিষয়ক

৪. শিশু-কিশোর সংক্রান্ত

৫. বিবিধ

সমাজ প্রতিনিয়ত চলমান। তেমনি মানুষেরও কোনো বিরাম নেই। এরই মধ্যে সুখ আনন্দ বেদনা হাসি-কান্না বিরহ মিলনের পর্ব রয়েছে। সমাজ গড়ে ওঠে মানুষের জন্যই। বিভিন্ন প্রকার চড়াই উতরাই এর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সমাজের পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। মানুষের মধ্যে প্রাচীন সময় থেকেই ছিল ভ্রান্ত ধারণা, যে শহর মানেই বিশাল কিছু, সবকিছুতে স্মার্ট, পারদর্শী সকল মানুষজন। এই ধারণা ভাঙতে জীবন সরকার 'ভিনগাঁয়ের রাজপুত্তুর' গল্পটি লেখেন। সেখানে দেখা যায় শহর থেকে একজন ছেলে আসে গ্রামে। তা দেখে গ্রামের মেয়েদের কত উৎসাহ ও উন্মাদনা- "ওই এলো। খবরটা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। ফুলবাগানে। গাছের ছায়ায়। নদীর কিনারে। কে এলো। কোথা থেকে এলো। ভিন গাঁয়ের রাজপুত্তুর। ঘোড়ায় চড়ে, না পালকিতে ? এসব কথা বাড়ির মহলে রিনিঝিনি বাজে। কি যেন বাজায়। কে এলো দাদার সঙ্গে শহরের লোক। থাকবে বেশ কিছুদিন। হাওয়া পরিবর্তন। কি যেন দাদা বলেছিল ফিসফিস করে। তা আবার সই ভ্রমর শুনেছে। কাঠ বাদামের নিচ ডালে পিড়ি বেঁধে দোল খাচ্ছিল। কাঁচা ডাসা পেয়ারা চিবুতে চিবুতে ঘাড় ঘুরিয়ে না শোনার ভান করে নিজের শরীরটা আরো জোরে দুলিয়ে দিয়ে উত্তর দিল- ঢং।"[১]

দেশভাগের ফলে ভিটেমাটি হারিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নেওয়া বাঙালীদের প্রতিমুহূর্তে যে দহন সহ্য করতে হয়েছিল তার চিত্র আছে 'হারানো ঠিকানা' গল্পটিতে। গল্পের কথক দেশভাগের ফলে ভিটেছাড়া হয়ে তিন-চার বছর ধরে কলকাতায় আছে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কাতারে কাতারে লোক আসতে লাগল দক্ষিণ কলকাতার জমিদার বাড়ির অধিকারে থাকা খালি জমি দখল করতে। জমি দখল করতে গিয়ে বিরাট লড়াই। জমিদারবাবুরা নিজেদের জমি রক্ষা করার জন্য ভাড়াটে গুণ্ডাদের নামিয়ে দিল। যাতে ওপার বাংলার বাঙালীরা বসতে না পারে, এই জমিতে। তার জন্য যত রকমের ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা যায়, তার সবরকম আশ্রয় নিল। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিল আশ্রয়ের সন্ধানে থাকা ছিন্নমূল বাঙালীরা। দেশহারা বাঙালীরা দলবেঁধে জায়গা নিয়ে দরমা লাগিয়ে ঘর বানিয়ে বসে পড়ল। এই জন্য অনেক ছোটখাটো যুদ্ধ হয়েছে। নিজেদের রক্ষা করার জন্য উদ্বাস্তু কলোনিতে তৈরী করা হল সংগ্রাম কমিটি, নাগরিক কমিটি, শান্তি রক্ষা কমিটি। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল পাশে এসে দাঁড়াল। যাদবপুর, বেলঘরিয়া, বাঘাযতীন, দমদম, নাগেরবাজার, হাওড়া, বালি, আগরপাড়া, নৈহাটি, শ্যামনগর, উল্টোডাঙ্গা, অর্থাৎ প্রায় গোটা কলকাতাকে ঘিরে ধরল এঁরা। যে জায়গায় লোকজন থাকত না সেখানেই জায়গা দখল করে বসে পড়ত ছিন্নমূল বাঙালীরা। কাজটা এত সহজ ছিল না। পদে পদে লড়াই করতে হয়েছিল। গুণ্ডা বাহিনির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। সমস্ত বাজারগুলির ফুটপাত দখল করে নিয়েছিল শুধুমাত্র মাথাটা গোজবার আশায়। লেখকের ভাষায়- "আজকে যে কলোনিগুলো দেখা যায়। এক সময় এই সব জায়গা জঙ্গল ছিল। ভেড়ি ছিল। বড়োলোকদের বাগানবাড়ি ছিল। মানুষের বাস করার মতো জায়গা ছিল না। কিন্তু পূর্ব-বাংলার লোকেরা এসে এখানে সোনা ফলিয়েছে। আগের বাঘাযতীন নেই। নিত্যনতুন নাম হয়েছে। নেতাজি নগর, বাপুজি নগর, বিদ্যাসাগর, সূর্যসেন নগর। এই সবই দেশভাগের ফল। এর মধ্যেই বিয়েশাদি, শ্রাদ্ধ, সব ঘটেছে জীবনের অঙ্গ হিসেবেই।"[২]

নাগরিক জীবনের ভোগবাদী মানুষের জীবনচর্যা নিয়ে প্রচুর লেখকের প্রচুর গল্প আছে। নগরবাসীর বিলাসিতা, উশৃঙ্খল জীবনযাপন, মদ্যপান ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু নগরের ফুটপাতবাসীরাও যে নগর জীবনের একটা অংশ, এদের কষ্টভরা জীবন নিয়ে খুব কম লেখকই গল্প লিখেছেন। জীবন সরকারের কলমের কালি ফুটপাতবাসীর চোখের জল থেকে সঞ্জীবনী সুধা নিয়েছে। 'নদীর মতন' গল্পে হেরলডরা এর উদাহরণ। পায়ে পায়ে রাস্তা ডিঙ্গাচ্ছে মানুষ। চারপাশে কথার পর কথা সাজিয়ে নদী-সমুদ্র হচ্ছে। হেরলডের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। নিজের মনে কাজ করছে- "কাজ না ছাই। দুনিয়ার নরক ঘাঁটা। কী আর করবে। পেটের দায়ে সবকিছু করতে হয়।"[৩]

ছোটো থেকেই হেরলড জেনে এসেছে ফুটপাত ওর ঘর। ফুটপাতই ওর সবকিছু। আশোপাশে ওর মতো যারা আছে ওদের মুখেই শুনেছে ওর নাম হেরলড। নিজের সম্পর্কে এর চেয়ে আর কিছুই জানে না। কে নাম রেখেছে তাও জানে না। তার সামনের ওই চার্চটার কেউ হয়তো রাখতে পারে। নিজের সম্পর্কে এর থেকে বেশি কিছু আর জানে না সে। জানবার কৌতূহল হয়েও জানতে পারেনি। হেরলড অ্যান্টোনি মার্কেটের সামনেই থাকে। ওখানেই স্নান, খাওয়া, রাতে শোয়া। ইন্টালি মার্কেটের ভিতরেই স্নান করার জায়গা-পায়খানা। ভাতের হোটেল, রুটি সবকিছু পাওয়া যায়। ফুটপাতে শুধু হেরলড একা নয়, আরো অনেকেই থাকে। এদের কষ্টভরা চিত্র লেখক দক্ষতার সাথে তুলে এনেছেন। শহুরে মানুষ বলতে আমরা বুঝি শুধুমাত্র কোর্টপ্যান্ট পরা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে চলাফেরা করা বাবুদের। অথচ যে রিক্সাচালক রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে, হোটেলের ছোট্ট যে ছেলেটি উচ্ছিষ্ট থালা বাসন মাজছে, যে বৃদ্ধ লোকটি বাবুদের জুতা পালিশ করে দিচ্ছে, তারাও যে বৃহত্তর নগর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত জীবন সরকার তাঁর গল্পে তার রূপ দিয়েছেন।

প্রকৃতি যে কত সুন্দর হতে পারে, প্রকৃতির মধ্যে যে কত সুঘ্রাণের ভাণ্ডার থাকতে পারে, জীবন সরকারের ছোটগল্পে বারবার তার অন্বেষণ গভীরভাবে ধরা পড়েছে- "কাকডাকা ভোরে শিউলি গাছতলায় কুয়াশা ছাড়ায় মটরশুঁটির আঁকসায়। একদিন শীত নামে বিড়ালের গায়। জলের মাছেরা চুপ হয়ে যায়। চারদিকে শীতবুড়ি জাঁকিয়ে বসে আছে। আগুন পোহানোর একটা মেলা বসে সন্ধ্যামালতীর উঠোনে। পিঠা-পার্বণে নানা উৎসবে গ্রামের বাড়ি মেতে ওঠে। মেয়েরা কাঁথা সেলাই করে। কখন-কখনও মায়ে ঝিয়ে এক সঙ্গে গ্রাম্য বিয়ের গীত গায়। কেননা সামনেই মধুমাস। দখিনা বাতাস বুঝিয়ে দেয়, এই মাস বসন্তকাল। কোকিল ডাকে কুহু.. কুহু। ভোরের স্নিগ্ধতা নিয়ে আসে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ইঙ্গিত।"[৪]

এর পরেই গল্পকারের বর্ণনা আরো চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে- বসন্ত উৎসবের পরেই পাতা ঝরার দিন। রুক্ষ পৃথিবী আগুন জ্বালে তপ্ত রৌদ্রের তাড়নায়। গাছেরা আকাশের দিকে তাকায়। মাছরাঙ্গা পাখি ডাকে- 'জল দে... জল দে'। একদিন ঘর বাঁশঝাড় কাঁপিয়ে কালবৈশাখী নামে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। এইভাবে ঘুরছে মাস, বছর। একটা ইতিহাস। এই ইতিহাস যেমন প্রকৃতির, তেমনি সময়ের এবং মানুষেরও। দাম্পত্য জীবনের সমস্যাকেও প্রকৃতির উপমা দিয়ে জীবন সরকার যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা তাঁর সমাজ মনস্তত্ত্বকে রঙিন করে তোলে- 'রোদের জন্য' গল্পে আছে- "গৌরী তার দাম্পত্য জীবনে এই রোদ-বৃষ্টির খেলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু, তা আর হলই না। তাদের দাম্পত্য-জীবন যেন একটা নিস্তরঙ্গ নদী। কোনো জোয়ার-ভাঁটা নেই। এই জীবন যেন দুটো মরা গাছের গুঁড়ি। রাস্তায় বেওয়ারিশ পড়ে রয়েছে। রাত নেই, দিন নেই, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই। আলো নেই, অন্ধকার নেই। কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। এই কি বাঁচা? এ কেমন বাঁচা?"[৫]

-অল্পকথায় কী অসামান্য ব্যঞ্জনা। শিল্পীর তুলি ও রংয়ের সাহায্যে রেখা বিন্যাস তৈরী হয়ে গেছে যেন। অসামান্য দক্ষতায় গল্পকার দাম্পত্য জীবনের হিমশীলতাকে চিহ্নিত করেছেন প্রকৃতির পটভূমিতে। প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নৈসর্গিক উপকরণগুলি তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

জীবন সরকারের গল্পে শিশু প্রেমের কথা বারংবার উঠে এসেছে। তারা পেটের দায়ে ছোট বয়স থেকেই কাজে নিয়োজিত হয়। 'আমরা করব জয়' গল্পেও টাবলু নামে এক পথ শিশুর জীবনচিত্র বর্ণিত হয়েছে। প্রাইমারি স্কুলে পড়াকালীন সময়েই তার বাবা এক পথ দুর্ঘটনায় মারা যায়। বাবার অবর্তমানে ছোট্ট টাবলুকেই সংসার চালানোর দায়িত্ব নিতে হয়। শিশুশ্রম অপরাধমূলক কাজ জেনেও হাটে বাজারে, চা মিষ্টির দোকানে, ছোট হোটেলে ছোট বাচ্চাদের দিয়ে কাজ করানো হয়। কারণ মালিকপক্ষ জানে পূর্ণ বয়স্ক মানুষদের যে বেতনে কাজ করানো হয় তার থেকে অর্ধেক বেতনে শিশুদের দিয়ে কাজ করানো যায়। শিশুর বিকাশ একমাত্র আদর্শ পরিবারের দ্বারাই সম্ভব, যার মাধ্যমে শিশুরা সৎ চরিত্রের অধিকারী হয়ে ওঠে। যেসব শিশুরা শৈশব কাল থেকেই

স্কুলে পড়া, খেলাধুলা ছেড়ে জীবন জীবিকার লড়াইয়ে নেমেছে এটা সভ্যতার কাছে লজ্জার ও অধঃপতনের বিষয়। লেখক এই গল্পের মাধ্যমে সমাজের এই দিক থেকেই তুলে ধরেছেন।

লেখকের 'শোকের মিছিল' গল্পে ছোট বাচ্চারাও অনেক সময় বদমেজাজি, হিংসুটে দৈত্যের মতো বড়দেরকে ভুল পথে চালনা করে তার প্রসঙ্গ রয়েছে। এই গল্পের এক চরিত্র রামকৃষ্ণবাবু যে এক বাগান মালিক। তাকে দেখতে বিদঘুটে, কদাকার। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা তাকে খ্যাপায়। কিন্তু রামকৃষ্ণ বাবুর ব্যবহার যতই খারাপ হোক না কেন তার মধ্যে যে একটা শিশুসুলভ মন ছিল তা তার মৃত্যুর পর বোঝা যায়। কারণ তিনি তার সমস্ত জমি, জিরেত, সম্পত্তি ছোট ছোট বাচ্চাদের খেলার বাগান তৈরির জন্য দান করে যান। আসলে কিছু কিছু মানুষের বাইরের দিকটা যতই শক্ত হোক, ভেতরটা থাকে স্নেহে ভরা। গল্পকার রামকৃষ্ণ বাবুর মধ্যে দিয়ে এই সকল মানুষদের বোঝাতে চেয়েছেন।

ছোটদের মধ্যে থাকে এক কল্পনার জগত। এই কল্পনায় তারা পক্ষীরাজ ঘোড়া, চাঁদের বুড়ি, তেপান্তরের মাঠ খুঁজে বেড়ায়। দেশভাগের পর শিশুদের মধ্যে রূপকথার কল্পনার জগত ভেঙে গিয়ে এক বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল। লেখক জীবন সরকারের 'চড়ুয়া' গল্পটিতে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী এক বালক রূপকথার ছোঁয়ায় স্বপ্ন দেখে। সেই রাজবাড়ীতে একশত রানী। তাদের রং বেরঙের ঝলমলে শাড়ি। গলায় মণিমুক্ত হার। মাথার ওপর সোনালি মুকুট, হাতে গলায় রং বাহারি অলংকার। লম্বা বিনুনির চুলে জুই বেলি ফুলের মালা। দরজায় দাঁড়িয়ে দাস দাসী। হলঘরে লাল নীল কাঁচের টুকরো বাসন। পাকলুকে ওরা চোখের ইশারায় ডাকছে। যখন পাকলু রাজবাড়িতে ঢুকলো তখন ওর হাতের ছাগল চড়ানোর লাঠিটা সোনার লাঠিতে পরিণত হলো। মহারানী পাকলুকে ডেকে রত্ন খচিত ঘরের মেঝের দিকে নিয়ে যেতেই সে আছাড় খেয়ে পড়ল।

জীবন সরকারের গল্পগুলি বহুমাত্রিক জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করে নিয়েছে। তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। ষাটের দশক থেকে শুরু করে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর তাঁর সাহিত্য সাধনা চলেছিল। জীবন সরকার তাঁর আত্মকথায় জানিয়েছেন বাংলাদেশ ও উত্তর বাংলার মানুষ, নদ-নদী নিসর্গই তাঁকে গল্পকার করেছে। তাঁর গল্পে ভাষার জোগান দিয়েছে। ফেলে আসা দেশের বঙ্গালী উপভাষা, উত্তরবঙ্গের কামরূপী উপভাষা, নিম্ন আসামের কিছু কিছু ভাষা (যেমন- প্রান্তিক নিম্নজীবি ভেড়া চরানো মানুষ, কুলি মজুর ইত্যাদি) তাঁর গল্পে এসেছে। শৈশবে জীবন সরকার দেখেছিলেন দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু হওয়া মানুষগুলির অসহনীয় অবস্থা। পূর্ববঙ্গের মানুষগুলির মুখের ভাষা তাঁর গল্পে কান্না হয়ে ব্যবহৃত হয়। তাই 'উৎখাত' গল্পে দেখি- "মাইরো না দোহাই তোমাদের। সব নিয়ে যাও। মাইরো না। দোহাই তোমাদের। সব নিয়ে যাও। মাইরো না। ভুবন উপুড় হয়ে পড়ে গজরাতে লাগল- হালা। তোরা ভাবছসটা কী ! দ্যাশ ছাইড়া আইছি বইল্যা আমাগো মানুষ মনে করস না। ইটা আমাগো দ্যাশ না ? যামু না- দেহি তো আমাগো তাড়ায় কেডা।"[৬]

'কোষা' গল্পেও দেখি পূর্ববঙ্গের ভাষার সুন্দর কথন। দেশভাগের যন্ত্রণায় ছিন্নমূল বাঙালী আশ্রয় নিয়েছে আসামে। সেখানে বাঙালীদের ওপর যে অত্যাচার চলে তার কান্নাভরা রূপ লেখক দেখিয়েছেন।

জীবন সরকারের জন্ম পূর্ববঙ্গে। কিন্তু পড়াশুনা ও জীবিকার জন্য তাঁকে যেতে হয়েছে কলকাতায়। নগর কলকাতার মানুষজনের ভাষা তাঁর গল্পে অসাধারণ ভঙ্গিমায় ব্যক্ত হয়েছে। শহুরে নাগরিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ ব্যস্ততা। মানুষ যেন ছুটছে আর ছুটছে। আর এই ব্যস্ততার প্রভাব তাদের ভাষা ভঙ্গীতেও পড়েছে। 'রোদের জন্য' গল্পে গৌরী চরিত্রের মাধ্যমে সেই ব্যস্ততার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন জীবন সরকার- "সাত-সকালেই হন্তদন্ত হয়ে সোনাদের বাড়িতে। সোনা, বুড়ি আর বুবু তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠল- 'বসুন'। বুড়ি সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস ধরিয়ে চা বসিয়ে দিল। গৌরী বলল- 'এখন চা খাব না। এখনি বেরিয়ে যেতে হবে। অনেক কাজ আছে এই কথাগুলি এমনভাবে হাত পা নেড়ে চোখমুখ ঘু '।...রিয়ে বেণী দুলিয়ে বলল যে, যেন, কোনো নাচের মহড়া চলছে।"[৭]

নাগরিক জীবনে মানুষের অসুখ-বিসুখ হলেই চিকিৎসার জন্য গড়ে উঠেছে রকমারি বেসরকারী চিকিৎসালয় বা নার্সিংহোম। এই নার্সিংহোমগুলোতে রোগী দেখার নাম করে যে ব্যবসা চলে তার দিকে আঙ্গুল দেখিয়েছেন লেখক। অনেক অনেক টাকার বিনিময়ে সেখানে চিকিৎসাটাই যেন একটা ব্যবসা। তবু শহুরে মানুষ কিছু হলেই নার্সিংহোমেই দৌড়ায়। তাই গল্পে দেখা যায় গৌরী বলেছে- "অপুর শাশুড়ীকে ভর্তি করে দিয়ে এলাম লাইফ লাইনে।"[৮]

গৌরী জানে লাইফ লাইন নার্সিংহোমের কর্তৃপক্ষ কতটা 'ডাকাত'। তবুও যেতেই হয়। নাগরিক জীবনের অতি আধুনিক সত্তায় সামাজিক মূল্যবোধের পরিধি যে কত নীচে নামতে পারে তা বোঝা যায়- "ফলে ছেলের সঙ্গে বাপের একটা দূরত্বের প্রাচীর তৈরি হয়ে গেছে। এখন তো ছেলে বাপকে তার নাম ধরেই ডাকে।"[৯]

মানবজীবনে সমাজ ও সভ্যতায় প্রেম এক অনশ্বর মৌলিক উপাদান। সভ্যতার উষালগ্নে যা ছিল একান্ত জৈবিক, জীবন ও সভ্যতার বিবর্তন ধারায় তা হলো মানসিক ও আত্মীক উপাদানও বটে। প্রেমের আরক্ত সংরাগের সঙ্গে মানবজীবনে এলো তার অন্তরঙ্গ ভূমিকা ও মৃত্যু অতিক্রমী জীবনের জয়স্তম্ভ গড়ে উঠল প্রেমের মহিমাময় আগ্রহে। জীবন সরকার জানতেন প্রেমের সেই অতন্দ্রলীলা রহস্যের রোমাঞ্চ। তাই 'ভোরের পাখি' গল্পের নায়ক চাবি হাতে নিয়ে অন্দরমহলের তালা খুলে বলতে থাকে- "-জানি, আমি অনেকজানি, ভোরের আকাশ মুঠো মুঠো আশীর্বাদ ছড়ায় পৃথিবীর - বুকে। সেই আশীর্বাদ ঝরে পড়ে শিশিরের টুপটাপ শব্দে। নদীর বুকে মৃদু শিহরণে আমি সেই আশীর্বাদ কুড়োতে এখানে আসি। শিউলি, মানুষকে সেই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতে নেই। এসব কথা তুমি জানো না। তোমার মা-ও জানেন না।"[১০]

আসলে প্রেমের অবস্থান গৃহে নয়, সূর্যালোকিত রাজপথে- উদ্বেলিত বাহুবন্ধে, প্রদীপিত জীবনের সমাহারে। এই প্রেমকে জীবন সরকার ব্যাখ্যা করেছেন কখনো নৈর্ব্যক্তিকভাবে, কখনো উল্লাস মুখরতায় আবার কখনো বা পরিকীর্ণ জনতার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে অস্ত সূর্যের মায়াময় আলো প্রক্ষেপণে। তাই গল্পের নায়ক শিউলির দিকে তাকিয়ে হাত চেপে ধরে কোনো এক উষ্ণ শিহরণের আবেশতায়। এই মহামুহূর্তকে জীবন সরকার ভাষা দেন এইভাবে- "শিউলি হৃদয়ের মুখের দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল ও হৃদয়কে দেখছিল, কিন্তু কোনো কথা শুনছিল না। হৃদয় হঠাৎ শিউলির হাতাখানা চেপে ধরল। শিউলির হাতের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল হৃদয়ের সারা শরীরে। কিন্তু সেই উত্তাপে হৃদয়ের তন্ময়তা ভাঙে না। সে বলে, 'শিউলি তুমি বলো, রোজ ভোরে -তুমি আসবে, যেমন আগে আসতে'।"[১১]

আসলে প্রেম এক বিমূর্তভাব- তা শিল্পে সঙ্গীতে নানা রঙে-রূপে-শব্দবন্ধে-ছন্দে-চিত্রকল্পে।

জীবন সরকারের গল্পে বিভিন্ন শ্রেণী নারী চরিত্রেরা ভিড় করে আছে। স্বভাবতই তাদের মুখের ভাষাও ভিন্ন। গ্রামীণ নারী, নাগরিক শিক্ষিত নারী, ঝগড়ুটে নারী, দেশ-ভাগের যন্ত্রণায় ভিটেমাটি ছিন্নমূল হয়ে আসা নারীরা তাদের নানান ভঙ্গির কথাবার্তায় জীবন সরকারের গল্পকে অন্য আকর্ষণ দিয়েছে। জীবন সরকার গ্রাম জীবনের অসামান্য রূপকার। গ্রামের নারীরা তাঁর গল্পে শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত ষড়যন্ত্রকারী বিভিন্ন রূপের গ্রামীণ নারীরা তাঁর গল্পে ভিড় করে আছে। এদের ভাষাভঙ্গিও আলাদা আলাদা। 'ভিন গাঁয়ের রাজপুত্তুর' গল্পে বৈকালী গ্রামের মেয়ে হলেও লেখাপড়া জানে। বান্ধবী ভ্রমরের সাথে তার মুখের কথা শুনলেই তা বোঝা যায়-

"-বালিস নে রাধে। কৃষ্ণ বিনে।

-মুখপুড়ি চুপ। আজেবাজে কথা বলবি না তো।

-না, না বলব না। কে এসেছে রে?

-জেনে তোর লাভ কী?

-বল না।

-আমি জানি না।

-মিথ্যুক। চোখ বলছে অন্য কথা। আমায় লুকোস না সই।

-তুই। ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল ভ্রমর।

-চল না বাড়িতে।"[১২]

জীবন সরকারের অনেক গল্পে গ্রামীণ পটভূমি এবং আঞ্চলিক জীবনের ক্যানভাসে লেখা বলে লোকসঙ্গীতের ব্যবহার অনিবার্যভাবে চলে আসে। এই গানগুলির ভাষা এই অঞ্চলের মানুষগুলির সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার চিত্র তুলে ধরে। উত্তরবঙ্গের লোকগান এবং পূর্ববঙ্গের গান দুই রীতির প্রয়োগই তাঁর গল্পে দেখা যায়। 'ভালো থেকো' গল্পে পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় গীত হয়েছে-

"চাতক পাখির এমনি ধারা
তৃষ্ণাতে প্রাণ যায় গো সারা, অন্য বারি পায় না
তারা মেঘের জল বলে দেখে কত দেয়গো
তবু চাতক মেঘের ভুলি
অমনি মত হলে আঁখি
শোধন মেলে।"[১৩]

ছোটদের নিয়ে লেখা বেশ কঠিন। সবাই পেরে ওঠেন না। কারণ ছোটদের নিয়ে লিখতে গেলে দরকার হয় এমন এক ভাষাশৈলী, যাতে করে লেখককে মনে মনে ফিরে যেতে হয় তাঁর শৈশবের ঝুলিতে। পূর্ববঙ্গে কাটানো বাল্যকাল এবং ছিন্নমূল হয়ে আসা উত্তরবঙ্গের নদী-নালা, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালিতে জীবন কাটানো জীবন সরকারও ছোটদের নিয়ে অসংখ্য গল্প লিখে গেছেন। ছোটদের নিয়ে লেখা তাঁর গল্পগুলি যেন তাঁর জীবনচর্যারই এক অপরিহার্য আকর্ষণ হয়ে হাজির হয়েছে। সেখানে পূর্ববঙ্গের বর্ণনা যেমন আছে, ছিন্নমূল জীবনচিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে উত্তরবঙ্গের অসামান্য প্রকৃতিতে আশ্চর্যভরা মৃত্তিকাগন্ধের পরিচয়। এই মৃত্তিকাতেই জীবন সরকার ছোটদের নিয়ে বয়সে বৃদ্ধ হয়েও মনের মধ্যে বালকের স্বভাব গেঁথে দিয়ে গল্পের পর গল্প বানিয়েছেন।

এই ছোটদের জন্য গল্প লিখতে গিয়েও জীবন সরকারের কলম বারবারই পৌঁছে গেছে সাহিত্যে ভাষার আলোচনা মুখ্যত লিখিত রচনাকে আবর্তিত করে থাকলেও রচনার ধ্বনিগত বিশ্লেষণের দিকটিও বিরাট তাৎপর্যের দাবী রাখে। লেখক ও পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ গড়ে তুলতে ধ্বনির বিন্যাস ধ্বন্যাত্মক অনুঘটকের কাজ করে। মূলতঃ ধ্বনির্ভির শৈলী বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই ধ্বনিকেন্দ্রিক শৈলীবিজ্ঞান এর জন্ম। পুনরক্তি (Recurrence), সমান্তরতা (Parallelism) ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিফলিত ধ্বনির বিন্যাস, মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব, ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ; ধ্বনিকেন্দ্রিকতা কিংবা ধ্বনিগত বিভিন্ন প্রক্রিয়া (যেমন- সংযোজন, বিয়োজন, রূপান্তর ইত্যাদি) প্রভৃতি নানা বিষয় ধ্বনিকেন্দ্রিক শৈলীবিজ্ঞানের আলোচ্য। সাধারণত গদ্য সাহিত্যের শৈলী বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে ধ্বনির পুনরুক্তিজনিত সৌন্দর্য, ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগ, প্লুতস্বরের ব্যবহার প্রভৃতিকে নিয়ে আলোচনা। অনেক সমালোচকই মনে করে থাকেন, শৈলী যদি এক ধরনের নির্বাচন হয়ে থাকে, তবে ধ্বনিগত প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রতিটি লেখকের আলাদা আলাদা প্রকাশভঙ্গীর অবকাশ থেকে যায়।

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, বাক্যের বিন্যাস মূলত দু'ভাবে ঘটতে পারে- আন্বয়িক (Syntagmatic) ও বৈকল্পিক (Paradigmatic) পদ্ধতিতে। বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষিক উপাদানের আনুভূমিক সম্পর্ককে আন্বয়িক সম্পর্ক বলা চলে। আবার, বাক্যের প্রতিটি উপাদানই লেখকের নিজস্ব ভাষা-ভাণ্ডার থেকে চয়ন করে আনা। তাই বাক্যে ব্যবহার করা উপাদানের সঙ্গে ভাষীর ভাষা ভাণ্ডারে উপস্থিত অন্যান্য সমধর্মী উপাদানের সম্পর্ক বৈকল্পিক। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির আলোচনায় প্রথমেই আমরা দেখে নেব হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ কোন ধরনের বাক্য ব্যবহারের প্রতি লেখকের অধিক প্রবণতা রয়েছে।

Conclusion: লেখক জীবন সরকারের গল্পের অসামান্যতা ছিল তাঁর ভাষার প্রয়োগের দক্ষতায়। তাঁর লেখার দক্ষতায় পাঠকের কাছে বিষয় যেন ছবির মত ফুটে ওঠে। তাঁর রচনার প্রকাশভঙ্গিতে ছিল লালিত্য ও মাধুর্য। শব্দের মধ্যে অসাধারণ ব্যঞ্জনার ব্যবহার করেছেন। লেখক সত্বার পাশাপাশি তাঁর ছিল সহনশীলতা, বাগ-বৈদুর্য। পাঠযোগ্যতা এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্য নির্মাণের গভীর সমন্বয়। জীবন সরকার এখানেই সার্থকতা লাভ করেছেন। তাঁর গল্পে ছিল এমন এক দীপ্তি যা বাঙালি মননকে নতুন চিন্তা করতে সাহায্য করেছে। জীবন সরকার ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে সাহিত্য চর্চা করেননি। তিনি জীবনকে অনুভব করেছেন একদম ভিতর থেকে। তাঁর জীবন ছিল নানান অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ। মাত্র ছয় বছর বয়সে দেশভাগ জনিত কারণে তাকে পূর্ববাংলা ছেড়ে উত্তরবঙ্গে চলে আসতে হয়। তাঁর লেখায় বারংবার বাংলাদেশের প্রকৃতি, নিজের গ্রামের কল কল করে বয়ে যাওয়া ধলেশ্বরী নদী ও ছিন্নমূল মানুষের ক্রন্দন ফুটে উঠেছে। লেখকের উত্তরবঙ্গে কাটানো শৈশব স্মৃতি তাঁকে আরও নস্টালজিক করে তোলে। তাঁর ভাবধারার মধ্যে পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, নগর কলকাতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

Reference

(১) সরকার, জীবন। (২০১১)। জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, পৃষ্ঠা- ১৫

(২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৭

(৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২১

(৪) সরকার, জীবন। (২০০৩)। স্বনির্বাচিত গল্প, ক্রন্দসী, পৃষ্ঠা- ২৬

(৫) সরকার, জীবন। (২০০৪)। সেজানের দিনরাত্রি, দোয়েল প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৩২

(৬) সরকার, জীবন। (২০১১)। জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, একুশ শতক, পৃষ্ঠা- ৪৫

(৭) পূর্বোক্ত, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, পৃষ্ঠা- ৩৬

(৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৮

(৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮

(১০) পূর্বোক্ত, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, পৃষ্ঠা- ৪১

(১১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪২

(১২) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৪

(১৩) পূর্বোক্ত, জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠগল্প, পৃষ্ঠা- ১৮৯

Citation: **Singha. M.,** (2025) "জীবন সরকারের ছোটগল্প : গঠনপর্ব ও বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-11, November-2025.